

শ্রদ্ধেয় বনভক্তের ৭৯তম জন্মদিন উপলক্ষে ঃ স্মারক পুস্তিকা :ঃ

প্রকাশ কাল : ৮ই জানুয়ারী ১৯৯৮ইং
২৫শে পৌষ ১৪০৪ বাংলা
বৃহস্পতিবার।

- সম্পাদকমণ্ডলী : ১। বাবু সুনীতি বিকাশ চাকমা
২। „ সঞ্জয় বিকাশ চাকমা
৩। „ নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা
৪। „ নির্মল কান্তি চাকমা

প্রতিবেদন

“প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনী”—একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় মূল তত্ত্ব এবং তথ্যের প্রচার ও প্রকাশনা সংস্থা। সাধক প্রবর সর্বজন পূজ্য আৰ্য পুরুষ শ্রীঃ সাধনানন্দ মহাশিবির (বনভন্তে) মহোদয়ের অমূল্য উপদেশ ও ধর্ম দর্শনায় অনুপ্রানিত হয়ে সাধকের শ্রীবুদ্ধি ও বিস্তৃতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গত ২১ শে আগষ্ট ১৯৫২ তারিখে কার্তিক্য ধর্মাল্লাগী দায়ক-দায়িকার সমন্বয়ে প্রকাশনীর প্রথম আন্তঃপ্রকাশ ঘটে এবং ১৯৯৫ইং সনের এবারনা পূর্ণিমা উপলক্ষে পকেট সাইজ পুস্তিকা “প্রকৃত বৌদ্ধ কে?” প্রকাশের মধ্য দিয়েই এই প্রকাশনীর শুভ পদযাত্রা শুরু হয়। মূলতঃ বইএর প্রথম বটি পৃষ্ঠায় প্রকৃত বৌদ্ধের গুণাবলী সম্বলিত যে সব বিষয় উল্লেখ রয়েছে সে সবই প্রকৃত বনভন্তের দেয়া এবং তাঁর অনুমোদনক্রমে বইটি ছাপা হয়। বইটি ছোট হলেও এটি বিষয়বস্তু সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। প্রকৃত বৌদ্ধ হিসেবে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার, তাঁর আচরণ এবং অনুশীলন কিরূপ হওয়া দরকার তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। তা ছাড়া আমরা যে প্রাণশই বিবিধ দানকর্ম সম্পাদন করে থাকি সে সবের প্রার্থনাসহ উৎসর্গের সূত্র সমূহ বাংলা অনুবাদসহ উল্লেখ রয়েছে। ফলে পাঠ্য ভাষায় উচ্চারিত শীল এবং সূত্রগুলি সম্পর্কে সন্মত ধারণা পাবার সুযোগ হয়। বাবু নবকুমার ওকঙ্গ্যা বইটির প্রকাশনা খরচের সিংহভাগ অর্থ যোগান দেয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনীর সম্পাদক বাবু নির্মল কান্ত চাকমার এলাত “কিসে :ঙ্গল হয়?” প্রকাশনীর আর একটি বই প্রকাশ পায়। এতে ‘মঙ্গল সূত্রের ৩৮টি মঙ্গল সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। প্রকাশনীর মহৎ উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখেই বিবিধ প্রতি-কূলতাকে উপেক্ষা করে এক এফ করে আমরা কাজে হাত দিতে শুরু করেছি।

১) উল্লেখ্য প্রকৃত বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধাভাব হতে সংঘরাজ ভিক্ষুগণীর

প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাশ্বির অঙ্কেয় ভক্তের শিষ্য গ্রহণ করার পর তাঁর ঠিকানায় তাইওয়ান থেকে প্রেরিত ৫৫ কার্টন (সর্বমোট ৪,৫৬৪টি) ধর্মীয় পুস্তক বনবিহারে দান করার সিদ্ধান্ত নিলে প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনীর অন্ততম সদস্য বাবু নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যার অর্থানুকূল্যে চট্টগ্রাম থেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়। পুস্তক সমূহ বর্তমানে রাজবন বিহার পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

২) ধর্মীয় পুস্তক সমূহ সংরক্ষণের জন্য একটি আলমিরাও দান করা হয়েছে।
৩) ধর্মীয় ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদান রাখার জন্য প্রয়াত ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ানকে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য প্রয়াত বাবু যামিনী রঞ্জন চাকমাকে কৃতজ্ঞতা সহকারে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে তাঁদের মরদেহে পুষ্প স্তবক প্রদান করা হয়েছে।

৪) অঙ্কেয় বনভক্তের স্মরণার্থে ১২ বৎসর যাবৎ প্রথম দান সাধনার স্থান ধনপাতায় একটি বিহার নির্মাণ কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রী যথাস্থানে নেয়া হয়েছে।

৫) অঙ্কেয় বনভক্তের নির্দেশে এবং আশীর্বাদে নিয়ে বর্তমানে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক সমূহের প্রিন্ট আউট কপি বের করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট একটি কমপ্যাঙ্কি ডিস্কে সংরক্ষিত মোট পঞ্চাশ হাজার এরশত উনসত্তর পৃষ্ঠা সম্বলিত মোট ১১৫ খণ্ড মূল ত্রিপিটক বই কম্পিউটারের সাহায্যে প্রিন্ট মাউটের কাজ শুরু হয়েছে। এ'টি অঙ্কেয় প্রজ্ঞানন্দ মহাশ্বির মহোদয় তেভেচ্ছা স্বরূপ বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি) কে অর্পণ করেছিলেন। পর-কর্তীতে তিনি এ'টি অঙ্কেয় বনভক্তের নিকট দান করলে তিনি প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনীর হাতে তুলে দেন। প্রকাশনীর একনিষ্ঠ সদস্য বাবু মৈত্রী প্রসাদ বীস। নিজ উদ্যোগে কম্পিউটারের মাধ্যমে উক্ত প্রিন্ট হ'তে এক এক করে ত্রিপিটক খণ্ড সমূহের প্রিন্ট আউট কপি বের করে যাচ্ছেন। এ' মঙ্গল পুণ্যকাজে সকলের অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কটি প্রিন্ট আউট কপি অঙ্কেয় বনভক্তের নিকট প্রকাশনীর উদ্যোগে দান করা হয়েছে। এছাড়া আরো অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যয় বহন করে দান

করেছেন। নিম্ন কম্পিউটার সেট এবং লেজার প্রিন্টার সেট না থাকায় কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আশা করা যাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থার অহুদানের মাধ্যমে এই সংকট কাটিয়ে উঠে সধর্ম প্রচারে নূনতম ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বৌদ্ধ দর্শন একটি নিখুঁত এবং অপরিবর্তনীয় দর্শন। এতে ভাবাবেগের নিম্ন যুক্তি প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সমসাময়িক কিছু কিছু প্রকাশনায় এর বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়ার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন কোন এক বিশেষ সাময়িকীতে একজন লেখক পক্ষীদের অন্তর্গত “মৃত্যু পানে সংযম” এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, মৃত্যু পান ত্যাগ একবারেই সম্ভব না হলেও আস্তে আস্তে মাত্রা কমিয়ে ত্যাগ করা প্রয়োজন। যদি তাই হয় তবে ব্যাভিচার, চুরি, মিথ্যাবাদ ও প্রাণী হত্যা এ ৪টি বিষয়ের ক্ষেত্রেও এ ব্যাখ্যা সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। মদের পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক না কেন কর্ম থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না কোন অবস্থাতেই। তা ছাড়া সংযম অর্থ আস্তে আস্তে বর্জন নহে। বৌদ্ধ দর্শনে সংযম অর্থ হলো সম্পূর্ণ রূপে বিরতি বা ত্যাগ। তাই এধরনের অপব্যাখ্যা যাতে সধর্ম অনুসারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে তজ্জন্তু সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। এসময়ক্রে অন্য আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ১৯৯৫ ইং সনের ৬ই অক্টোবর রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত “চংক্রমণ” বইয়ে “প্রবারণা অধিষ্ঠান” শীর্ষক যে ক্ষমা প্রার্থনা সন্নিবেশ করা হয়েছে তার কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে, যা প্রকৃত বনভাস্তুর নির্দেশে প্রথম প্রচলিত প্রার্থনায় ছিল না।

যেমন :—বিগত প্রবারণা হইতে বর্তমান প্রবারণা পর্যন্ত জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমি যে সমস্ত দোষ, অপরাধ, ভুল-ত্রুটি করিয়াছি— বাক্যটির স্থলে প্রকৃতপক্ষে সঠিক ছিল এরূপ — “গত প্রবারণা হইতে বর্তমান প্রবারণা পর্যন্ত জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমার যাহা কিছু ভুল-ত্রুটি, দোষ অপরাধ দৃষ্ট বা ক্ষত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতেছি।”

সংগত কারণেই কেউ যদি মনে করেন তিনি গত প্রবারণা হ'তে বর্তমান প্রবারণা পর্যন্ত কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ করেন নাই, তবুও তিনি জেনে শুনে কেনইবা 'করিয়াছি' বলে স্বীকার করবেন। বরং কল্যাণ "দৃষ্ট বা ক্ষত হইয়াছে" অর্থাৎ যদি কেহ দেশে থাকেন বা গুমে থাকেন। তাই এটিই ছিল শ্রদ্ধেয় বনভস্কের নির্দেশিত বাক্য।

নেহাং সমালোচনার ষাতিরেই সমালোচনা-অর্থে বিষয়টি ভুলে ধরা হয়নি। সংগোধন করার নিতান্তই প্রয়োজন আছে মনে করেই বিষয়টি ভুলে ধরা হলো। এ'তে কারোর মনে কোন প্রকার চ্যুৎ পাবার অবকাশ থাকবে বলে আমরা মনে করিনা।

তাই বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব এবং তথ্যকে ঠিক রেখে সহজ এবং সরল ভাষায় ব্যাখ্যা প্রদান করে ধর্মীয় পুস্তক সমূহ সাধারণের হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনীর আত্মপ্রকাশ। এ ব্যাপারে আমাদেরকে আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সম্ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছেন পরম পুণ্যপন্থ শ্রদ্ধেয় বনভস্ক।

গত ৮ই জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং রাজবন বিহারে শ্রদ্ধেয় বনভস্কের প্রথম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। তখন থেকেই রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির পাশাপাশি প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনী ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শ্রদ্ধেয় বনভস্কের জন্মদিন পালন করে আসছে। তিনি অত্র রাজবন বিহারে প্রতিনিয়ত অগণিত পুণ্যার্থীকে অবিশ্রান্তভাবে ধর্মোপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয় তিনি অত্রাকলে দিকে দিকে বিচরণ করে সূচু পরিভ্রম বৌদ্ধ সমাজ গঠনেও ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর উপদেশে উদ্ধুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মানুষ যে সং ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে ত্রুটি হয়েছেন, নৈতিক চরিত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছেন এবং সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ তাঁর ৭১তম জন্মদিন উপলক্ষে আমরা তাঁর উপদেশ ও শিক্ষা সক্রিয়ভাবে শ্রবণ করছি। শুধু রাজবন বিহারে নয় প্রতিটি শাখা বিহার সমূহে এবং বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে গৌরব ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রদ্ধেয় বনভস্কের এ' জন্মদিনটি পালনের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে বলে আমরা মনে করি।

আজকের এই জন্মদিন উৎসবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট আমাদের প্রার্থনা—
অত্যাশ্রমে জাতি, ধর্ম বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে চিরস্থায়ী শান্তি
ফিরে আসুক। সকলের চিত্তে প্রজ্ঞা উদয় হয়ে একটি সুষ্ঠু সমৃদ্ধগামী বৌদ্ধ
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক।

“সকল প্রাণী সুখী হোক”

সংশোধনী

রাজবন বিহারের চতুর্বিংশতিতম কঠিন চীবর দান স্মরণিকায় আমার
প্রকাশিত ‘কাছে থেকে দেখা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবং রাজবন বিহার’ শীর্ষক
প্রবন্ধের ১৫ পৃষ্ঠার ২৪-২৫ লাইনে অনবধান বশতঃ রাজবন বিহার কমিটির
উদ্ধৃতি লেখা হয়েছে। এটি পড়তে হবে ‘সম্প্রতি প্রজ্ঞা সাধনা প্রকাশনী
দমিদেব’ উদ্ধৃতি। পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ এই বিষয়টি আমাকে অবগত
কারিত্ব দেয়ায় তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ শরণংকর ভিক্ষু

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ৭৯তম জন্মদিনে

—স্মৃতি বিকাশ চাকমা (সক)।



প্রকৃতির নিয়মে দিন আসে, দিন যায়।
এভাবে সৃষ্টির আদিকাল থেকে দিন-রাত্রির
পালাবদল ঘটে চলেছে। এতে বিশ্বের
কিছু নেই। তবুও বলার অপেক্ষা রাখেনা
যে, বিরল ব্যতিক্রমে এমন একেকটা দিন
আসে যে দিনটি তাৎপর্যের উজ্জলতার
হয় চির ভাস্বর। তখন সেই দিনটি সমস্ত

মানুষের স্মরণীয় দিন হিসেবে মহাকাল তা' ধারণ করে রাখে। মহাকালের
ইতিহাসে ঠিক তেমনি একটি তাৎপর্যময় দিন ১৯২০ সনের ৮ই জানুয়ারী।
সেদিন নিত্যকার নিয়মে পূর্ব দিগন্তে আলোর বর্ণচ্ছটার ঋণাধারায় উদ্ভূত
হয়েছিল সূর্য। মহাকালের মাঝে যোগ হয়েছিল আরো একটি নতুন
দিন,—সেদিন। এই দিনে সবুজ-শ্রামল, ছায়াঘেরা কর্ণফুলী পাড়ের
“মোরঘোন” নামক এক অজ্ঞ পাড়া গাঁয়ের এক মধ্যবিত্ত চাকমা পরিবারে
একটি নামহীন ফুটফুটে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার নাম রাখা হয়েছিল
রথীন্দ্র। তাঁর পিতা হারুমোহন চাকমা ও মাতা বীরপতি চাকমা সেদিন
জানতেন না যে, এই শিশুটি একদিন বৌদ্ধ জাতির ইতিহাসের পাঠ্য
একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবেন। তাঁর পাড়াবাসীরাও জানতেন না যে,
তাঁদের পাড়াগাঁয়ের সেই নবজাত শিশুটি এতদিন তাঁর সাধনা কর্মের
সিঁদ্বিলাভে ধস্ত হয়ে জ্ঞানের সোঁতলে হয়ে উঠবেন একজন অনন্ত সাধারণ
আর্যপুরুষ এবং স্বগ্রামের, স্বদেশের ও স্বজাতির ললাটে অঙ্কিত করবেন এক
গৌরব টিকা। সেদিনের রথীন্দ্র নামের শিশুটি আজকের দিনের মহিমান্বিত
আর্যপুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)।

আজ চই জানুয়ারী। সেই আর্থপুরুষের ৭৯তম জন্মদিন। এই শুভদিন উপলক্ষে রাজবন বিহারে সম্পাদিত হচ্ছে বহুবিধ পুণ্যানুষ্ঠান। “প্রজ্ঞা সাধনা একাশনী” পক্ষ থেকেও পুণ্যানুষ্ঠান সম্পাদনের মাধ্যমে এই শুভদিনটি পরম সৌন্দর্য সহকারে পালিত হচ্ছে। এই শুভ দিন উদ্‌ঘাপনের অনুষ্ঠানটি বৌদ্ধ জনসাধারণকে ধর্মীয় প্রেরণার নতুন প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেকে সদ্ধর্মের আকর্ষণে উজ্জীবিত হবেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই শুভ দিনে শ্রদ্ধেয় বনভক্তের গৃহাঙ্গীকরণ ও সাধনাকালীন সময়ের কিছু কথা প্রাসঙ্গিক কারণে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

বাল্যকালে তিনি উচ্চ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। তৎকালীন সময়ে সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চল। কিন্তু তখন এখানকার বৌদ্ধসমাজে ধর্মের চরম পরিহানি ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব তখন দ্রুত গতিতে বৌদ্ধসমাজকে গ্রাস করতে বসেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংমিশ্রনে বৌদ্ধ সমাজে গণ্ডাবলি প্রথাসহ নানা ধরনের পুণ্য ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। বৌদ্ধ সমাজে ধর্মের এতেন পরিহানি ও গৃহবাসের নানা দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করে যুবক রথীন্দ্র সংসার জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে মুক্তির সন্ধানে গৃহ হতে বের হয়ে ১৯৪৯ সনে চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কিন্তু গুরুর নিকট বুদ্ধজ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা না দেখে অবশেষে গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ করে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ চিংমরম বৌদ্ধ বিহারে উপস্থিত হন।

উক্ত বিহারের বিহারাধ্যক্ষ মহোদয়ের উপদেশে তিনি নির্জন অরণ্যে ধ্যান-সাধনায় মনোনিবেশ করার সঙ্কল্প নিয়ে ধনপাতা নামক স্থানের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে বুদ্ধজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধনা কালে তিনি ক্রমাগত জয় করার জন্য ছয়-তিন দিন অন্তর পিণ্ডাচরণ বের হতেন এবং নিদ্রাকে জয় করার জন্য গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে শনবনে দাঁড়িয়ে থাকতেন ও শীতকালে গভীর রাতে পানিতে নেমে পড়তেন। এভাবে কঠোর সাধনায় ক্রমে তাঁর অবিচ্ছিন্ন অঙ্ককার দূর হতে থাকে ও রথীন্দ্র শ্রমণ নামে দিকে দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কাপ্তাই বাঁধের জলে তাঁর সাধনাস্থলের নিকটস্থ জনপদ সমূহ নিমজ্জিত হওয়ায় তথাকার বাসিন্দারা

অন্ততঃ চলে যায়। ১৯৬০ সালে বাঁধের জল ওঠার আগে দ্বিধীনালার জনৈক নিশিমানি চাকরার আমন্ত্রণক্রমে তিনি ওধায় চলে যান ও বোয়াল-বালাী মৌজার এক বনে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সনে মহাভিক্তু সংঘের উপস্থিতিতে তাঁর ভিক্তু উপসম্পদা সম্পন্ন হয়। উপসম্পদা দানকালে মহাভিক্তু সংঘ রবীন্দ্র অমণ সাধনাতেই আনন্দ লাভ করেন বিধায় ইহার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর নাম রাখেন শ্রীমৎ সাধনানন্দ ভিক্তু। তিনি বনে বসে বাস করেন বিধায় উপসম্পদা গ্রহণের পর হাতে সর্বসাধারণের নিকট “বনভক্তে” নামে সমধিক পরিচিত হন। ১৯৭০ সনে দূরছাড় গ্রামে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ওধায় কয়েক মাস অবস্থান শেষে লংগুছ বাসীদের আমন্ত্রণক্রমে তিনটিলা বিহারে আগমন করেন। অতঃপর চাকরা রাজ পরিবারের অগ্রণী ভূমিকায় রাংগামাটিতে আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৭৭ সনে রাজবন বিহারে চলে আসেন ও তদবধি তিনি এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভক্তে মহোদয় একজন্ম সাধনার সিদ্ধিলাভী লোকোত্তর আর্ষণ্যপুরুষ। তিনি একজন বিচিত্র ধর্মকথক। তাঁর বাচনভঙ্গী সংদীপ্ত কিন্তু ব্যঞ্জনাময় ও হৃদয়গ্রাহী এবং তাঁর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য তনুত। তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী থেকে উপমা চয়ন করে ধর্মদেশনা করেন যা’ শীল সমাধি ওজ্ঞা ও নির্বিকল-প্রদ দেশনায় ভরপুর। চারি আর্ষণ্য, আর্ষণ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি ও সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে তাঁর ধর্মদেশনার বিষয়বস্তু। তিনি নিয়ত সিংহনাদে উপদেশ দেন যে,— “আত্ম দমন, চিত্ত দমন ও ইন্দ্রিয় দমন ব্যতীত মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত। তিনি বলেন, জাতিবাদ সর্বপ্রকার মতবাদ ভ্যাগ ও সন্ত-আত্মা হননে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান লাভ করা যায়।”

বলাবাহুল্য, তাঁর শুভ জন্মদিন পালন উপলক্ষে সম্পাদিত হচ্ছে প্রতিটি ভক্তপ্রাণ বৌদ্ধ নরনারীর হৃদয়াবেগ, আনন্দে আপ্ত হচ্ছে তাঁদের হৃদয়। ধর্মীয় পরিহানির কারণে দীর্ঘ বছ কুগাবধি এতৎকালের বৌদ্ধের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত হয়েছেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি ছিল অজ্ঞাত, বুদ্ধ ধর্মগুরুর অভাবে তাঁরা এতকাল ধরে পাননি ধর্মীয় পথ নির্দেশ। সমাজ জীবনে এই আত্মঘাতী ধর্মীয় বিস্মরণ এখানকার বৌদ্ধ সমাজের সম্মুখযাত্রা ও অগ্রগমনকে কুয়াশাচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত ও ব্যাহত করেছে নানা

ভাবেই, কতি করেছে বৌদ্ধ সমাজকে। এককাল ধরে এটা দীর্ঘ দুঃসময়ের কাল চলে আসছিলো। সৌভাগ্যের বিষয়, আজকের যুগে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আবির্ভাবে এখনকার বৌদ্ধেরা পেয়েছেন তাঁদের সত্যিকারের ধর্মগুরু ও কল্যাণ মিত্রকে। তাঁরা জানতে পারছেন ধর্মীয় নীতি আদর্শের নানা বিষয় ও শিক্ষা। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করতে পারাটাই হচ্ছে আজকের দিনে সবার আনন্দের উৎস। এই শুভ জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে আজ অগণিত বৌদ্ধ নরনারী এতাদৃশ আনন্দ উৎসবে অবগাহন করছেন আরো অধিকতর অনুপ্রাণিত হচ্ছেন ধর্মীয়ভাবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সত কণ-জন্ম মহান আর্ষপুরুষ এই পার্বত্যাঞ্চলের বৌদ্ধ সমাজে জন্মগ্রহণ করে ধৃত ও গৌরবান্বিত করেছেন এতদঞ্চলের বৌদ্ধ জনগণকে, পুত-পবিত্র করেছেন পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিটি শুল্কবণাকে। বহু যুগ ধরে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে তিনি সদ্ধর্ম এচারে আত্মনিবেদিত হওয়ার ধর্মের নামে প্রচলিত বহু কুসংস্কারকে চুরমার করে দিয়ে বৌদ্ধ সমাজকে সত্য ধর্মের পথে ধাবিত করার অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই মহান অবদানের জন্য এতদঞ্চলের বৌদ্ধ সমাজ তাঁর প্রতি থাকবে চির কৃতজ্ঞ। অনন্তকাল ধরে বৌদ্ধ সমাজে গীত হবে তাঁর জয়গান, কীর্তিত হবে তাঁর সুমহান কীর্তিগাথা। তিনি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে পূজিত হবেন প্রতিটি ভক্তপ্রাণ নরনারীর হৃদয়ে এবং চিরকাল হয়ে থাকবেন এতদঞ্চলের বৌদ্ধ জনগণের অনিশেষ ধর্মীয় প্রেরণার উৎসরূপে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আজকের শুভ জন্মদিনে তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রভাবে পার্বত্যাঞ্চল তথা সারাদেশে সুখ শান্তি বিরাজ করুক ও বিশ্ববাসী কল্যাণ দর্শন করুন—আজকের এই শুভদিনে এটাই সবার আন্তরিক প্রত্যাশা।

“সকল প্রাণী সুখী হোক।”

পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি

— নির্মল কান্তি চাকমা

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ। এ' এলাকায় বসবাস করে প্রায় তেরটি বিভিন্ন ভাষাভাষির লোক। তাদের জীবনধারা, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রায় ভিন্ন। তৎমধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যা আরও কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হ'লেও তাদের সামাজিক জীবনধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একইভাবে অসংখ্য জাতিসত্তাদের বেলায়ও তাই। প্রাচীনকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এ' এলাকায় সংখ্যা গরিষ্ঠ চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হ'লেও তারা মূল বৌদ্ধ ধর্মকে সঠিক ভাবে আচরণ করতে পারেনি। কারণ তখনকার সময়ে রাউলিরা বিভিন্ন ধর্মীয় কার্য সম্পাদন করতেন। তার পাশাপাশি বৈদ্যরা বিবাহ অনুষ্ঠান, বিভিন্ন পূজা, বলিদান ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করত। সে' সময় সমাজে গাংপূজা, খানমানা, মা লক্ষ্মীকে নতুন অন্নদান, মাটি ও আকাশকে অন্নদান, বিভিন্ন অশুখ থেকে আরোগ্য লাভের বিশ্বাসে পশু বলিদান ছিল সামাজিক রীতিনীতি। বিবাহ অনুষ্ঠান, মৃতের সংকার, সাপ্তাহিক ক্রিয়া, পূজা-পার্বন, যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান মদ ছাড়া সম্পন্ন হতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হ'লে উক্ত সব কুসংস্কার সমাজের মধ্যে থাকার কথা ছিল না। সে' সময় গুটি কয়েক স্থানে বৌদ্ধ বিহার, মন্দির থাকলেও সে' গুলোতে পৌরহিত্য করতেন মারমা (মগ) ভিক্ষুরা। তাঁদের ভাষার সাথে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষার মধ্যে মিল ছিলনা বলে তারা (মারমা ভিক্ষুরা) ধর্মদেশনা করলে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা সন্ধর্মকে বিশেষভাবে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারতেন না। ফলে বৌদ্ধধর্ম তাদের কাছে ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এ' ভাবে দীর্ঘকাল ধরে সন্ধর্মের ধারা চল আসছিল।

তার পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষাতাষি বড়ুয়া ভিক্টুরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধধর্মকে প্রচার ও শিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরা অনেকেই সমতল ভূমির বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। আর অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অনাথ আশ্রম করতঃ গরীব চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদেরকে প্রব্রজ্যা প্রদান করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের জন্য স্কুলে ভর্তি করাতেন। এ' ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে সঙ্কর্মের ধারা চলতে থাকে। সে' সময়কার বড়ুয়া ভিক্টুদের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত কিছু সংখ্যক চাকমা বৌদ্ধ ভিক্টু এখনো কয়েকটি স্থানে বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম স্থাপন করতঃ শ্রামণ ও ভিক্টুদের সঙ্কর্মের শিক্ষাকে বাহ্য দিতে স্কুল ও কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। আর অনেকে শিক্ষা-লাভ করে চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন।

১৯৫৬ ইং সনে বার্মায় ষষ্ঠ মহা সংঘায়ন অনুষ্ঠিত হয়। অত্রাকাল হতে পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাধর্মের উক্ত সংঘায়নে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ ইং সনে তিনি স্বদেশে ফিরে এলে তদানিন্তন চাকমা রাজ বাহাদুর মেজর রাজা ত্রিদিব রায় রাজ বিহারে রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কুসংস্কারের অন্ধকারে প্রায় নিমজ্জিত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এলাকার সঙ্কর্ম প্রচারে প্রায় হৃদয়ক কাল নিজেদের আত্মনিরোগ করেন। তাঁর সময় বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ বিহার, মন্দির গড়ে উঠে। বিশেষ করে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায় থেকে অনেকেই প্রব্রজ্যা দিয়ে ভিক্টু ও শ্রামণসংঘ সৃষ্টি করেন। সে সময় বুদ্ধপূজা, কঠিন-চীর দান, সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান প্রায় প্রত্যেক জায়গায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। তিনি অত্র এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। শ্রদ্ধেয় রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাধর্মের সঙ্কর্ম প্রচারের সময়কালে ধনপাতায় এক বনশ্রামণের নাম শুনা যেত। তখন তাঁর তেমন কোন আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তিনি সব সময় গভীর অরণ্যে থাকতেন বলে তাঁর সাথে যে কেহ ইচ্ছা করলেও দেখা করতে পারতেন না। কাণ্ডাই বীরের ফলে দ্বিতীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় তিনি যখন দীঘিনালায় চলে যান, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই মাঝে মধ্যে দায় কবা ভিক্টুর আমন্ত্রণে

মাড়া দিতে শুরু করেন। ১৯৭৭ সনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির কিছুকাল আগে তাকে স্বশিষ্যক রাজ্যমাটি রাজবন বিহারে আমন্ত্রণ করে আনার পর হ'তে তিনি এখানে বিহারাধ্যক্ষ হিসেবে অধিষ্ঠিত আছেন। পঞ্চাশ-ষাট দশকের সম্যকালে যে বনশ্রামণের কথা শুনা যেত, ইনিই সেই সর্বজনপূজ্য সাধক ও বর শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহুবি মহোদয়। তিনি কোন এক দেশনায় বলেছিলেন, "আমি ২৭ বৎসর ধ্যান সাধনা করে অবিচ্ছা, কৃষ্ণা, জীবনমঙ্গ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছি।"

প্রত্যহ দুই দূরান্ত হ'তে শত শত পুণ্যাথী তাঁর দর্শন লাভের প্রয়োণায় রাজবন বিহারে আগমন করে থাকেন এবং দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হচ্ছেন। তিনি আবির্ভূত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জ্ঞানহারা পথ-হারা, অবিচ্ছা, অন্ধকারে ও বিভিন্ন কুশিকা' কুসংস্কারে নিমজ্জিত নরনারী-পেলো আলোর সন্ধান। তাঁর মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোদম জ্ঞান প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সমাজের কুসংস্কার, কুশিকা, ভ্রান্ত সমাজ নীতি অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান বৌদ্ধসমাজে তার সেই গাংপুজা, ধানমানা, লক্ষ্মীপূজা, বলিদান আরও অনেক প্রাচীন কুপ্রথাও নেই বললেই চলে। তার পাশাপাশি রাউল, ওঝা, বৈষ্ণা আর ছদ্মবেশী সঙ্ঘের স্বজাধারীরা ম্লান হয়ে পড়েছে। রাউল আর ওঝা-বৈষ্ণের মন্ত্রের পরিবর্তে আজ ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে "বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি, সংঘ শরণং গচ্ছামি।"

শ্রদ্ধের বনভন্তের সঙ্ঘের ব্যাধ্যা (ধর্মদেশনা) শুনে অজ পাড়া গাঁও হ'তে শুরু করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় আই, এ, বি, এ, এম. এ এমনকি ডক্টরেট ডিগ্রীধারী তাঁর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক সঙ্ঘ অনুশীলনে অতী হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর অনেক শিষ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর অরণ্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে ধ্যান সাধনায় রত আছেন। সঙ্ঘপ্রাণ দায়ক দায়িকাগুলিও বিশূল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে একটির পর একটি শাখা বনবিহার নির্মাণ করে যাচ্ছেন। অতীতের সঙ্ঘের চেতনা আর বর্তমানের সঙ্ঘ অনুশীলন কি পরিমাণ ভ্রান্ত তা জ্ঞান কৃষ্টিতেই দৃশ্যমান।

শ্রদ্ধের বনভন্তে তাঁর দেশনা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলে থাকেন কোন ভিক্ষুর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা হীনম্রের লক্ষণ ও সঙ্ঘের পরিহানি। তাঁর অমৃতময় দেশনা হতে সহজ সরল প্রাণ সদর্শনুরাগীরা জানতে পেরেছেন অতীতে ও বর্তমানে কারা ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও অন্যচার স্বত্বিকারী। জয় হোক শ্রদ্ধের বনভন্তের, মঙ্গল হোক তাঁর অনুসারীদের।

"সকল প্রাণী স্তুতী হোক"